শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।
অনুত্তমো দুরাধর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতিরাত্মবান্॥২২

শাংকরভাষ্য : সর্বশক্তিমত্তয়া *ঈশ্বরঃ*। বিক্রমঃ শৌর্যম্, তদ্‌যোগাৎ *বিক্রমী*। ধনুরস্যাস্তীতি *ধন্বী* ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিপ্রত্যয়ঃ। 'রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্' (গীতা ১০।৩১) ইতি ভগবদ্বচনাৎ।

মেধা বহুগ্রন্থধারণসামর্থ্যম্, সা যস্যাস্তি স *মেধাবী*। 'অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ' (পাণিনিসূত্রম্ ৫।২।১২১) ইতি পাণিনিবচনাদ্বিনিপ্রত্যয়ঃ।

বিচক্রমে জগদ্ বিশ্বং তেন *বিক্রমঃ* বিনা গরুড়েন পক্ষিণা ক্রমাদ্বা।

ক্রমণাৎ, ক্রমহেতুত্বাদ্ বা *ক্রমঃ*, 'ক্রান্তে বিষ্ণুম্' (মনু ১২।১২১) ইতি মনুবচনাৎ।

অবিদ্যমান উত্তমো যস্মাৎ সঃ *অনুত্তমঃ*। 'যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ' (না উ ১২।৩) ইতি শ্রুতেঃ, 'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ' (গীতা ১১।৪৩) ইতি স্মৃতেশ্চ।

দৈত্যাদিভির্ধর্ষয়িতুং ন শক্যত ইতি *দুরাধর্ষঃ*। প্রাণিনাং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম কৃতং জানাতীতি *কৃতজ্ঞঃ*। পত্রপুষ্পাদ্যল্পমপি প্রযচ্ছতাং মোক্ষং দদাতীতি বা। পুরুষপ্রযত্নঃ কৃতিঃ ক্রিয়া বা; সর্বাত্মকত্বাত্তদাধারতয়া বা লক্ষ্যতে কৃত্যেতি বা *কৃতিঃ*।

স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ *আত্মবান্*। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি' (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১) ইতি শ্রুতেঃ॥ ২২॥

ভাবানুবাদ :

নারায়ণ প্রাণস্বরূপ, তিনিই প্রাণেশ। 'প্রাণদঃ' সম্বোধনে বিমোহিত ভীষ্ম প্রাণের অনুবৃত্তি এখানে নিয়ে এসেছেন শক্তির পরিভাষায়। প্রাণ স্বয়ং উর্জা, প্রাণ এবং শক্তি সমার্থক শব্দ। স্বরূপত যিনি প্রাণ, তাঁর শক্তিও অসীম, অচিন্ত্য, অপার। তাই প্রাণপ্রসঙ্গের অনুষঙ্গে এই প্রকরণে পিতামহ স্তুতি করছেন নারায়ণের শক্তির, সামর্থ্যের, বিক্রমের।

পিতামহ নারায়ণকে ডেকেছেন 'ঈশ্বর' নামে, জগৎ যাঁর ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সরস ভঙ্গিমায় বলছেন, "এই জীবজগৎ, মনবুদ্ধি, ভক্তিবৈরাগ্যজ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য। যে বাবুর ঘর-দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল সে বাবু কিসের বাবু। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাকত তাহলে কে মানত!" ওই ঐশ্বর্য বা কর্তৃত্বই শক্তির দ্যোতক। ভাষ্যকার বলছেন :

'সর্বশক্তিমত্তয়া ঈশ্বরঃ'—তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তিনি ঈশ্বর।

ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলছেন, "আমার ওপর নির্ভর করো, আমাকে আশ্রয় করো, আমাতেই আসক্ত হও, তাহলে আমার সমগ্রতার ধারণা করতে পারবে"—"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।/ অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥" (৭।১)—কী তাঁর সেই সমগ্রতা? আচার্য শংকর তাঁর গীতাভাষ্যে বলছেন, "সমগ্রং সমস্তং বিভূতি-বল-শক্ত্যৈশ্বর্যাদি-গুণ-সম্পন্নং মাম্।" টীকাকার আনন্দগিরি বলছেন, "বিভূতির্নানাবিধৈশ্বর্যোপায়-সম্পত্তিঃ। বলং শরীরগতং সামর্থ্যম্। শক্তির্মনোগতং প্রাগল্ভ্যম্। ঐশ্বর্যম্ ঈশিতব্য-বিষয়ম্ ঈশন-সামর্থ্যম্।"

ওই বিশাল শৌর্যবীর্যের অধিনায়ককে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পিতামহ সম্বোধন করছেন 'বিক্রমী' উচ্চারণে। সমস্ত পুরাণ নারায়ণের বিক্রমগাথায় মুখর। তিনি জগতের পালকপিতা। সৃষ্টিরক্ষা তথা দৈত্যদলন দেখতে পাই তাঁর প্রতি পদক্ষেপে। তাঁর নিজেরই উদ্‌ঘোষণ—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" সৃষ্টির আদিতেই পাই তাঁর মধুকৈটভ দলনের কথা। সত্যযুগের একটি অদ্ভুত কাহিনি সহস্রকবচ অসুর এবং নরনারায়ণের সংগ্রাম। সহস্রকবচ কঠোর তপস্বী এবং অবধ্য। ব্রহ্মাজীর বরপ্রাপ্ত তাঁর একহাজারটি এমন কবচ ছিল যে প্রতিটি কবচ নষ্ট করতে হলে আক্রমণকারীর এক হাজার বছরের তপস্যা চাই। এমনই ভয়ংকর শক্তিশালী অসুরের দম্ভে-অত্যাচারে সৃষ্টি যখন প্রায় বিপন্ন, তখন স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে বধ করতে এলেন। হিমালয়ের কেদারমণ্ডলে সরস্বতী নদীর তীরে নরনারায়ণের সে এক নিদারুণ তপস্যা। লক্ষ্মীদেবী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রুক্ষ পাহাড়ি জমিতে ছায়া ঘনিয়ে দিলেন বদরী (কুল) গাছের আশ্রয়ে। বদরীবনের তপস্বী হলেন বদরীনাথ। দীর্ঘদিন অনাহারে কৃচ্ছ্রতায় নারায়ণের তপঃসিদ্ধ বদরীবনভূমিই আজকের বদরীনাথধাম। নশো নিরানব্বইটি কবচ যখন নিঃশেষিত তখন সহস্রকবচকে আশ্রয় দিলেন সূর্যদেব। সূর্যের শরণে এসে সে-যাত্রায় সহস্রকবচ বেঁচে গেলেন।

ওই একটিমাত্র কবচ নিয়ে সেই অসুর আবার দ্বাপরে জন্ম নিলেন সূর্যপুত্র কর্ণরূপে। নরনারায়ণকেও আসতে হল অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণরূপে। মহাভারতে দেখতে পাই, কর্ণই ছিলেন দুর্যোধনের শক্তি। অর্থাৎ ওই একটিমাত্র 'কবচ'-এর শক্তিতেই ঘটল কুরুক্ষেত্রের মতো একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানতেন কর্ণের শক্তির রহস্য, অর্থাৎ এই কর্ণই সেই সহস্রকবচ। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যপূজার পরে ব্রাহ্মণদের দান করতেন কর্ণ। ওই দুর্বলতার সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ একদা সংগ্রহ করে নিলেন সেই অবশিষ্ট কবচটিকে। কর্ণবধ হল। সত্যযুগের তীর্থ বদরীনাথধাম তাই আজ ভূ-বৈকুণ্ঠ—নারায়ণের তপঃস্থলী।

ত্রেতায় তিনিই রাম—হাতে ধনুর্বাণ। গীতাতে ভগবান তাঁর বিভূতির ব্যাখ্যা করেছেন—শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রাম—'রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্' (১০।৩১)। শস্ত্রধারী অর্থাৎ ধনুর্ধারী শার্ঙ্গ নারায়ণের ধনুর্ধারী অবতাররূপের অনুধ্যান করে পিতামহ নারায়ণকে ডাকছেন 'ধন্বী' উচ্চারণে। 'ধনুষ্' শব্দ ব্রীহ্যাদিগণের অন্তর্গত হওয়ায় 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' (পাণিনিসূত্র ৫।২।১১৬) সূত্রের নিয়মে 'ইনি' প্রত্যয়যোগে 'ধন্বী' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। ধনুক হাতে নিলেই তিনি রাম হয়ে ওঠেন না, যেমন পাঁকে উৎপন্ন হলেই একটি বস্তু 'পঙ্কজ' হয়ে ওঠে না। তেমনই 'ধন্বী' শব্দের বা বাক্যের বাচক রাম একটি ব্যাবহারিক বা প্রচলিত প্রয়োগ (শাস্ত্রীয় পরিভাষায় রূঢ়ি প্রয়োগ)। 'হরধনু' যাঁর হাতে শোভিত তিনিই ধন্বী। তুলসীদাসজী রামের শ্রীহস্তে হরধনুর বর্ণনা

করছেন : "দমকেউ দামিনী জিনি জব লয়ঊ। পুনি নভ ধনু মণ্ডলসমভয়ঊ॥" (রামচরিতমানস, বালকাণ্ড, দোঁহা ২৬০, চৌপাই-৩)—রামের হাতে হরধনু এল আকাশে বিদ্যুতের ঝলকের মতো, মণ্ডলের মতো আকাশ জুড়ে শোভিত হল রামধনু। আকৈশোর রাম ধনুকহাতে দনুজদলনেই ব্যস্ত। কতই বা বয়স তখন তাঁর, বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞে বসবেন, রাম আশ্বাস দিচ্ছেন : "প্রাতঃ কহা মুনি সন রঘুরাই। নির্ভয় জগ্য করহু তুমহ জাই॥" (তদেব, দোঁহা ২০৯, চৌপাই ১)—প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনাথ মুনিবরকে বললেন, আপনি নির্ভয়ে যজ্ঞ সম্পাদিত করুন। নারায়ণের সেই কল্যাণকারী শস্ত্রধারী মূর্তির নাম—শ্রীরাম, মর্যাদাপুরুষোত্তম।

ষোড়শ মাতৃকাশক্তির অন্যতম শক্তি মেধা। মেধা অন্যতম বৈষ্ণবী শক্তি—সরস্বতী। মেধাসূক্তে বন্দনা করা হয়, "দৈবী মেধা সরস্বতী সা মা মেধা সুরভির্জুষতাং স্বাহা" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪)। ভাষ্যকার বলছেন, বহু গ্রন্থের (তত্ত্বের) ধারণসামর্থ্যই মেধা। ওই সমর্থতা যাঁর ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান তিনি মেধাবী। পাণিনির 'অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ' সূত্রানুসারে (৫।২।১২১) মেধা পদের সঙ্গে 'বিনি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মেধাবী' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

গীতার ধ্যানে আমরা আচার্য কৃষ্ণকে স্তুতি করি: "সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ" —সমস্ত উপনিষদের তত্ত্বকে যিনি গোদোহনের মতো নিষ্কাশন করেছেন, আত্মস্থ করেছেন, সেই মহান আচার্যকে প্রণাম, 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।'

অনুপ্রাসের আনন্দে পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে স্তুতি করে চলেছেন। বিক্রমী... বিক্রমঃ ক্রমঃ। ভাষ্যকার বলছেন, যিনি জগতকে বেষ্টন করে আছেন তিনি বিক্রম। অথবা 'বি' পদের অর্থ পক্ষিবিশেষ, ক্রমঃ পদের অর্থ চলন—গরুড়পৃষ্ঠে যিনি চলেন। গরুড় যাঁর বাহন তিনি বিক্রমঃ, এমন অর্থও হতে পারে।

'ক্রমঃ' শব্দের অর্থ গতি। নারায়ণকে পিতামহ বলছেন 'ক্রমঃ' কারণ গতিময়তায় তিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে অতিক্রমণ কেউ করতে পারে না। সর্বত্র তাঁর গতি, তাঁর গতিকে কেউ রোধও করতে পারে না। কোনও কোনও গবেষক এমন ব্যাখ্যাও করেছেন যে নারায়ণই ক্রমঃ, কারণ তাঁকে আশ্রয় করেই জীব মায়ার সাগর অতিক্রম করে যায় : "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।/ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীতা ৭।১৪)

'ক্রমণাৎ ক্রমহেতুত্বাদ্ বা'—গতির কারণে অথবা ক্রমশঃ বিস্তৃতির জন্যও নারায়ণকে অভিহিত করা যেতে পারে 'ক্রমঃ' সম্বোধনে। মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ভাষ্যকার বলছেন, গতির অপর নাম বিষ্ণু। নারায়ণের গতি প্রসঙ্গে শুকদেবজী একটি অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করেছেন। গজেন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় (শ্রীমদ্‌ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ) নারায়ণ যখন অধীর হয়ে গরুড়ের পিঠে আকাশপথে এলেন, তখন তিনি 'ছন্দোময়েন গরুড়েন সমুহ্যমানঃ' (৮।৩।৩১)—'ছন্দোময়' গতির অর্থ ইচ্ছানুসারী বেগ অর্থাৎ মনের গতির থেকেও বেশি। শ্রীধরস্বামী এর অর্থ করেছেন 'অতিশীঘ্র'—ছন্দোময়েন ইতি শৈঘ্র্যোক্তম্।

ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তির প্রতিভূ নারায়ণ সমস্ত কর্মভাবনার চূড়ান্ত। তিনিই শীর্ষে, শিখরতম সত্তা—অনুত্তমঃ। ভাষ্যকার অর্থ করছেন, 'অবিদ্যমান উত্তমো যস্মাৎ সঃ'—যাঁর থেকে উত্তম আর কেউ নেই, হতে পারে না, তিনিই অনুত্তম। নারায়ণ উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" (১২।৩)—যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, হতে পারে না। দেবকী-বসুদেব যখন সন্তানকামনায় পৃথ্নি-সুতপা রূপে তপস্যা করছিলেন, নারায়ণের দর্শন পেয়ে প্রার্থনা করলেন, "তোমার মতো একটি পুত্রসন্তান

লাভ হোক আমাদের।" নারায়ণ হেসে বলেছিলেন, "আমার মতো আর দুটো নেই, আমিই একমাত্র আমার মতো, আমিই তোমার গর্ভে আসব"—"অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্।/ অহং সুতো বামভবং..." (ভাগবত, ১০।৩।৪১)। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে অর্জুনকে বলছেন, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (৭।৭)—জগতে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।

বিশ্বরূপদর্শনে ভাবে-ভক্তিতে আপ্লুত অর্জুনের একটি স্তবের আলোয় ভাষ্যকার নারায়ণের 'অনুপম' সত্তার বর্ণনা করেছেন : "হে অপ্রতিমপ্রভাব, হে অতুলশক্তি, আপনিই এই চরাচর জগতের পিতা, স্রষ্টা। আপনিই পূজ্যতম, গুরুর গুরু। ত্রিলোকে আপনার সমান আর কেউ নেই। আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?" (১১।৪৩)

বিক্রমী, অনুত্তমঃ ইত্যাদি সম্বোধনের অনুবৃত্তি নিয়ে আবার উচ্চারণ—দুরাধর্ষঃ—যাঁকে বলপূর্বক অবদমিত করা যায় না। এটিও শ্রেষ্ঠত্ববাচক সম্বোধন। আসুরিক শক্তি যখনই সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সচেষ্ট হয়েছে, তখনই তাকে ব্যর্থ করেছে যে-ঐশী শক্তি, দৃশ্যত অদৃশ্যত সেটিই অচিন্ত্য বৈষ্ণবী শক্তি—দুরাধর্ষ। সমস্ত পুরাণে নারায়ণের এই তীক্ষ্ম মেধাশক্তি এবং অকল্পনীয় বাহুবলের বিস্তৃত গাথা আছে। 'ভস্মাসুর' যার শিরে হাত রাখবে, সেই ভস্ম হয়ে যাবে। শুনে নারায়ণ তাকে ডেকে বললেন, "নিজের মাথায় হাত রেখে দেখ দেখি যে শক্তিটি পেয়েছ সেটি সত্যি কি না?" নিজের মাথায় হাত রেখে নিজেই ভস্ম হয়ে গেল সেই বীর অসুর। সমুদ্রমন্থনের সময়ে মোহিনীর বেশে বিষ্ণু ছলনা করলেন দৈত্যদের। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে কী কৌশলে বধ করলেন রাক্ষসী পুতনাকে। কালীয়দমন, কংসচানুর বধ তাঁর অকল্পনীয় বাহুবলের নিদর্শন।

এই সমস্ত নিগ্রহের পশ্চাতে কোনও দ্বেষবুদ্ধি নেই, ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহই একমাত্র কারণ। অসীম সেই অনুগ্রহশক্তি।

অন্যের কৃতকর্মের যিনি জ্ঞাতা, অথবা সঠিক মূল্যায়নকারী, তিনি কৃতজ্ঞঃ। ভাষ্যকার বলছেন, প্রাণিবর্গের পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্মের অর্থাৎ পুণ্য এবং পাপকর্মসমূহের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতা ভগবান নারায়ণ। এই জন্মের পুণ্যকর্মের ফল যিনি ঠিক ঠিক পরজন্মে পাবেন ভিন্নদেহবর্তীরূপে, অথবা এই দেহে কৃত পাপকর্মের শাস্তি পাবেন যিনি পরজন্মে ভিন্ন দেহে—সেই প্রাণীর সমস্ত কৃতকর্মের জ্ঞাতা, ভগবান কৃতজ্ঞ সম্বোধনের বাচ্য।

গীতাতে ভগবান বলেছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যিনি যেভাবে (মোক্ষ, জ্ঞান, অন্যবস্তুর জন্য অথবা আর্তি নিবারণের জন্য) আমার উপাসনা করেন, আমি (সর্বফলদাতা পরমেশ্বর) তাঁকে সেই ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি, অর্থাৎ সকামকে তাঁর কাম্যফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি।

ভাষ্যকার গীতায় আরও একটি শ্লোকের অবতারণা করে নারায়ণের ব্যাবহারিক কৃতজ্ঞতাবোধের প্রসঙ্গ করেছেন। নারায়ণের 'বিনয়'-ও অদ্ভুত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।/ তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" (৯।২৬)—ভক্ত ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা-কিছু আমাকে অর্পণ করে, আমি খুশি হয়ে তা গ্রহণ করি। এই কৃতজ্ঞতার অনুধ্যান করতে গিয়ে অনেক টীকাকার শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দ্রৌপদীর হাতে হাঁড়িতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট 'শাক' পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন, বিদুরের স্ত্রীর হাতে কলার খোসা খাওয়া; রাম-অবতারে শবরীর হাতে ফল খাওয়া, অন্ত্যজ রন্তিদেবের হাতে জল গ্রহণ করা ইত্যাদি লীলার মনন করেন।

শক্তির প্রকাশ কার্য। কার্যের সম্পাদনই কৃতি। কৃ-ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'কৃতি' শব্দ উৎপন্ন হয়। ভাষ্যকার বলছেন, কৃতি মানে পুরুষার্থ, পুরুষপ্রযত্ন, করণীয় অথবা কর্তব্য। কৃতির যিনি সম্পূর্ণ বাস্তবরূপ দেন তিনিই কৃতকৃত্য।

সমস্ত প্রাণীর সমস্ত কর্মের লক্ষ্য তো ঈশ্বর, কারণ তিনিই সর্বাত্মা। সমস্ত কর্মের তিনিই প্রেরণা, আধারও তিনি।

অন্তিমে এসে পিতামহ যেন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, আমাদের সমস্ত কর্মের, সমস্ত শক্তির, সমস্ত প্রচেষ্টা-ভাবনার উৎসমূলে ভগবান। তাঁর শক্তিতেই আমরা শক্তিমান। কেনোপনিষদে রয়েছে, যখন অগ্নি-বায়ু প্রমুখ দেবতা আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেদের কর্মশক্তিকে 'চরম' বা 'পরম' বলে ভাবতে শুরু করেছেন, সেই মুহূর্তেই ভগবান তাঁদের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জিত হয়ে তাঁরা উপলব্ধি করছেন, তাঁদের শক্তির উৎস তাঁরা নিজেরা নন। সমস্ত উপনিষদ একবাক্যে স্বীকার করছেন, ব্রহ্মের সত্তায় সমস্ত বস্তু সত্তাবান, ব্রহ্মেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। তিনিই স্বমহিমায় দীপ্যমান, স্বতন্ত্র। সেখানে দ্বিতীয় কোনও সত্তা নেই—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা..." (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১)—যেখানে অন্য কিছু দেখা, শোনা বা জানা যায় না, তা-ই ভূমা। সেই ভূমায় যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই আত্মবান। 'স্বে মহিম্নি'—তিনি আত্মমহিমায় স্থিত। তাঁর অন্য কিছু পাওয়ার নেই। তিনি আপ্তকাম।

প্রাণের প্রসঙ্গে এসে পিতামহ অবতারণা করলেন বিক্রমের, কৃতির। তারপর যেন ছান্দোগ্যের সনৎকুমারের ভাষায় বলছেন : সুখের জন্যই সকলে কর্ম করে, সুখ না পেলে কেউ কর্ম করে না (৭।২২।১)। কিন্তু সুখ অল্পেতে নেই, যা ভূমা তাই সুখ (৭।২৩।১)—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।" হে যুধিষ্ঠির, "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য," সেই ভূমাকে অন্বেষণ করা উচিত। *(ক্রমশ)*

লেখক-লেখিকার প্রতি

* নিবোধত পত্রিকার জন্য যে লেখাটি পাঠাতে চলেছেন তার একটি হুবহু নকল অবশ্যই নিজের কাছে রাখবেন। **আমরা কোনও পাণ্ডুলিপি (মনোনীত বা অমনোনীত) ফেরত দিই না।**
* আপনার পাঠানো প্রবন্ধের সঙ্গে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরের উল্লেখ অবশ্যই করবেন।
* আগে কোথাও ছাপা হয়েছে এমন লেখা পাঠাবেন না।
* শুধু ধর্মীয় প্রসঙ্গ নয়—দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, বরেণ্য সাধক ও মহাপুরুষদের কথা নিয়ে ইতিবাচক লেখা আমরা প্রকাশ করি। লেখা ১৫০০ থেকে ২০০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
* ধারাবাহিক রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে।
* সমালোচনার জন্য দুটি বই পাঠাবেন। কবিতা বা গানের বইয়ের সমালোচনা হয় না।
* **তথ্যসূত্র সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও, কোনও উদ্ধৃতি মূল গ্রন্থের সঙ্গে না মিলিয়ে প্রকাশ করা হয় না। তাই যথাযথ উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এবং তথ্যসূত্র উল্লেখ করে সহযোগিতা করুন।** তথ্যসূত্রে এই ক্রম অনুসরণ করুন : *লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান ও বর্ষ,* খণ্ড বা ভাগ (যদি থাকে) এবং পৃষ্ঠা।
* আপনাদের সুলিখিত প্রবন্ধগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যতুল্য। আশা করি, শ্রীশ্রীমায়ের মঠের পত্রিকায় আপনাদের লেখালেখির ধারা অব্যাহত থাকবে। শ্রীভগবান আপনাদের সারস্বত সাধনা সার্থক করুন এই প্রার্থনা।

—সম্পাদিকা